অটোইমিউন রোগ - আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস
অ্যালার্জেন - পরাগরেণু, বিড়ালের লোম।

অধ্যায় ১০ মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
Protection of Human Body (Immunity)

মানবদেহে সংক্রমণ এড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে দেহের ভিতরে জীবাণুর প্রবেশে বাধা দেওয়া। চামড়া, ক্ষত, নাক, মুখ বা অন্য যেকোনো উপায়ে জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হলে শুরু হয় আক্রান্ত জীবাণুর সংক্রমণ থেকে দেহকে বাঁচানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস। দেহের ভিতরে ও বাইরে রোগ জীবাণু ধ্বংসের এক জটিল ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা **ইমিউনতন্ত্র** নামে পরিচিত। যে প্রক্রিয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে **ইমিউনিটি** (immunity) বা **অনাক্রম্যতা** বলে। ইমিউনিটি দুর্বল হলে **ভ্যাক্সিন** বা **টিকা** দিয়ে সবল করে তোলা হয়।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অ্যান্টিবডি
- অ্যান্টিজেন
- ম্যাক্রোফেজ
- নিউট্রোফিল্স
- ফ্যাগোসাইটোসিস
- প্রতিরক্ষা স্তর
- সহজাত প্রতিরক্ষা
- অর্জিত প্রতিরক্ষা

পিরিয়ড সংখ্যা-৯ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলস এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ● প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ○ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ○ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংসে পরিপাক নালির এসিড ও উৎসেচকের ভূমিকা ● দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ (Macrophases) ○ নিউট্রোফিলস (Neutrophils) ● তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ সহজাত (Inborn) ○ অর্জিত (Acquired) ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার (Vaccine) ভূমিকা ● দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি (Memory) কোষের ভূমিকা

ইমিউন প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন কোষের ভূমিকা

ইমিউন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় (immune defense) অনেক ধরনের কোষ, অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় কাজের মাধ্যমে দেহকে সুস্থ-সবল রাখতে সদা তৎপর রয়েছে। নিচে এসব কোষের নাম, উৎপত্তিস্থল ও কাজের উল্লেখ করা হলো।

কোষের নাম	উৎপত্তি	কাজ
লিউকোসাইট (নিউট্রোফিল)	অস্থিমজ্জা	ফ্যাগোসাইটোসিস; প্রদাহকে ঘিরে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্ষরণ।
বেসোফিল	অস্থিমজ্জা	প্রদাহ সৃষ্টিতে হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্ষরণ।
ইওসিনোফিল	অস্থিমজ্জা	বহুকোষী জীবাণু ধ্বংস; দ্রুত অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দান।
মনোসাইট	অস্থিমজ্জা	ম্যাক্রোফেজের অনুরূপ (নিচে দেয়া আছে)।
লিম্ফোসাইট	ভ্রূণীয় স্টেমকোষ	নির্দিষ্ট ইমিউন সাড়ার শনাক্তকারী কোষ (recognition cells) হিসেবে কাজ করে।
B-কোষ	-	নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে B-কোষের কোষঝিল্লির রিসেপ্টরে যুক্ত করে অ্যান্টিজেন নির্ভর ইমিউন সাড়ার সূত্রপাত ঘটায়; নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে হেলপার T-কোষের সামনে তুলে ধরে।
সাইটোটক্সিক T-কোষ	-	টার্গেট কোষের কোষঝিল্লিতে যুক্ত হয়ে সরাসরি কোষকে ধ্বংস করে।
হেলপার T-কোষ	-	সাইটোকাইন (cytokines) ক্ষরণ করে B-কোষ, সাইটোটক্সিক T-কোষ, NK-কোষ ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে।
NK-কোষ	-	ভাইরাস আক্রান্ত ও ক্যান্সার কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংস করে।
প্লাজমা কোষ	প্লীহা, টনসিল, লসিকা গ্রন্থি	অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
ম্যাক্রোফেজ	সমস্ত টিস্যু ও অঙ্গ	ফ্যাগোসাইটোসিস; বিষাক্ত রাসায়নিক ক্ষরণের মাধ্যমে বহিঃকোষীয় ধ্বংস কার্যক্রম; হেলপার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেন উপস্থাপন।
মাস্ট কোষ	সমস্ত টিস্যু ও অঙ্গ	প্রদাহের সঙ্গে জড়িত হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ।

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defense Mechanism of Human Body)

রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে মানবদেহ ৩টি প্রতিরোধ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। প্রত্যেকটি কৌশলকে একেকটি **প্রতিরক্ষা স্তর** (line of defense) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি ব্যবস্থা ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে সদা সর্তক রয়েছে। মানবদেহের ৩টি প্রতিরক্ষা স্তর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নিচে উল্লেখ করা হলো।

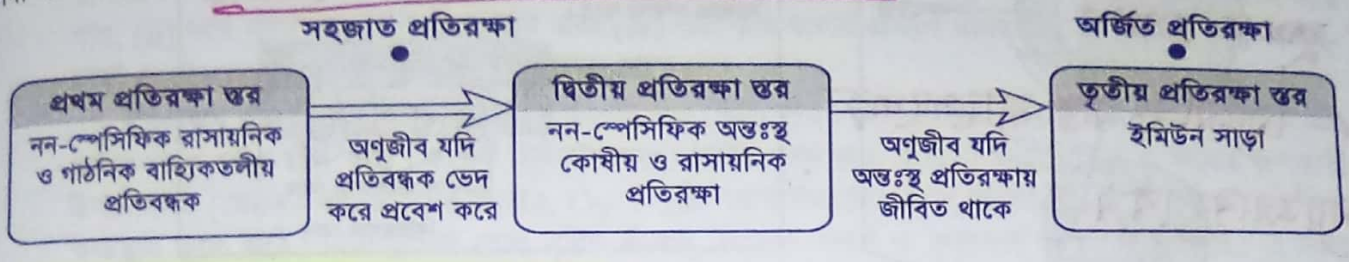

১. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিকতলীয় প্রতিবন্ধক (chemical and physical surface barriers) হিসেবে বহিরাগত যে কোনো অণুজীব বা কণাকে দেহের ভিতরে প্রবেশে বাঁধা দেয় তাকে **প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এ প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে সব বহিগরাগত পদার্থকেই ক্ষতিকর বিবেচনা করে দেহে প্রবেশে নিম্নোক্ত ভৌত-রাসায়নিক প্রতিবন্ধকের মিলিত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই এ স্তরটি **নন-স্পেসিফিক** (non-specific) স্তর নামে পরিচিত।

ক. **ত্বক** (Skin/Integument; integere = to cover) : ত্বক চারভাবে একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে : (i) গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, জলাভেদ্য (waterproof) ও অধিকাংশ পদার্থের প্রতি অভেদ্য; (ii) সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়; (iii) এসিডিক p^H; এবং (iv) ঘামগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি। ত্বক মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ

খ. **লোম** (Hairs) : নাকের ভিতরকার লোম ধূলা-ময়লা আটকে দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতিকর পদার্থের যাতায়াত বন্ধ করে রাখে।

গ. **সিলিয়া** (Cilia) : দেহের প্রবেশ পথগুলো মিউকাস ঝিল্লিতে (mucous membrane) আবৃত থাকে। মিউকাস ঝিল্লিময় অনেক অংশ (যেমন– শ্বাসনালি) আণুবীক্ষণিক ও সদা বহির্মুখী আন্দোলনরত সিলিয়ায় আবৃত থাকে। বহিরাগত কণা ও অণুজীব এ ঝিল্লির আঠালো মিউকাসে আটকে দলা পাকিয়ে হাঁচি-কাশি-থুথু হিসেবে বহির্গত হয় কিংবা পাকস্থলিতে এসে পৌঁছায়।

ঘ. **অশ্রু ও লালা** (Tears and Saliva) : অশ্রু ও লালা আমাদের অজান্তে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অশ্রু ও লালায় যে **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম রয়েছে তা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। লালা মুখগহ্বরকে শুধু সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে না, গহ্বরের প্রাচীর যেন শুকিয়ে ফেটে না যায় সে কাজও করে। এ কারণে কেনো জীবিত ব্যাকটেরিয়া মুখের ক্ষতি করতে পারে না। বরং লালামিশ্রিত হয়ে সরাসরি পাকস্থলিতে পৌঁছে আরও শক্তিশালী এসিডের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়। চোখকে বারংবার ভিজিয়ে দিয়ে অশ্রু বহিরাগত কণা ও অণুজীবের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ঙ. **সিরুমেন** (Cerumen or Ear wax) : বহিঃকর্ণের কর্ণকূহর নামক অংশের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হলদে-বাদামি রংয়ের মোমের মতো পদার্থকে সিরুমেন বলে। কানের পর্দায় যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য সিরুমেনে আটকে শক্ত দলায় অর্থাৎ কানের **খইল**–এ পরিণত হয়।

চ. **পৌষ্টিকনালির এসিড** : খাদ্য ও পানির সঙ্গে অনেক ধরনের ক্ষতিকর অণুজীব পাকস্থলিতে এসে জমা হয় এবং পাকস্থলির শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়।

ছ. **রেচন-জননতন্ত্রের এসিড** : রেচন-জননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গের ক্ষরণ প্রচন্ড এসিডিক ও আঠালো হয়ে থাকে। অনুপ্রবেশিত অণুজীব সহজেই আঠালো ক্ষরণে আটকে যায় এবং পরে ফ্যাগোসাইট এগুলোকে গ্রাস করে বা মূত্রত্যাগের সময় সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়। যোনিতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে অন্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

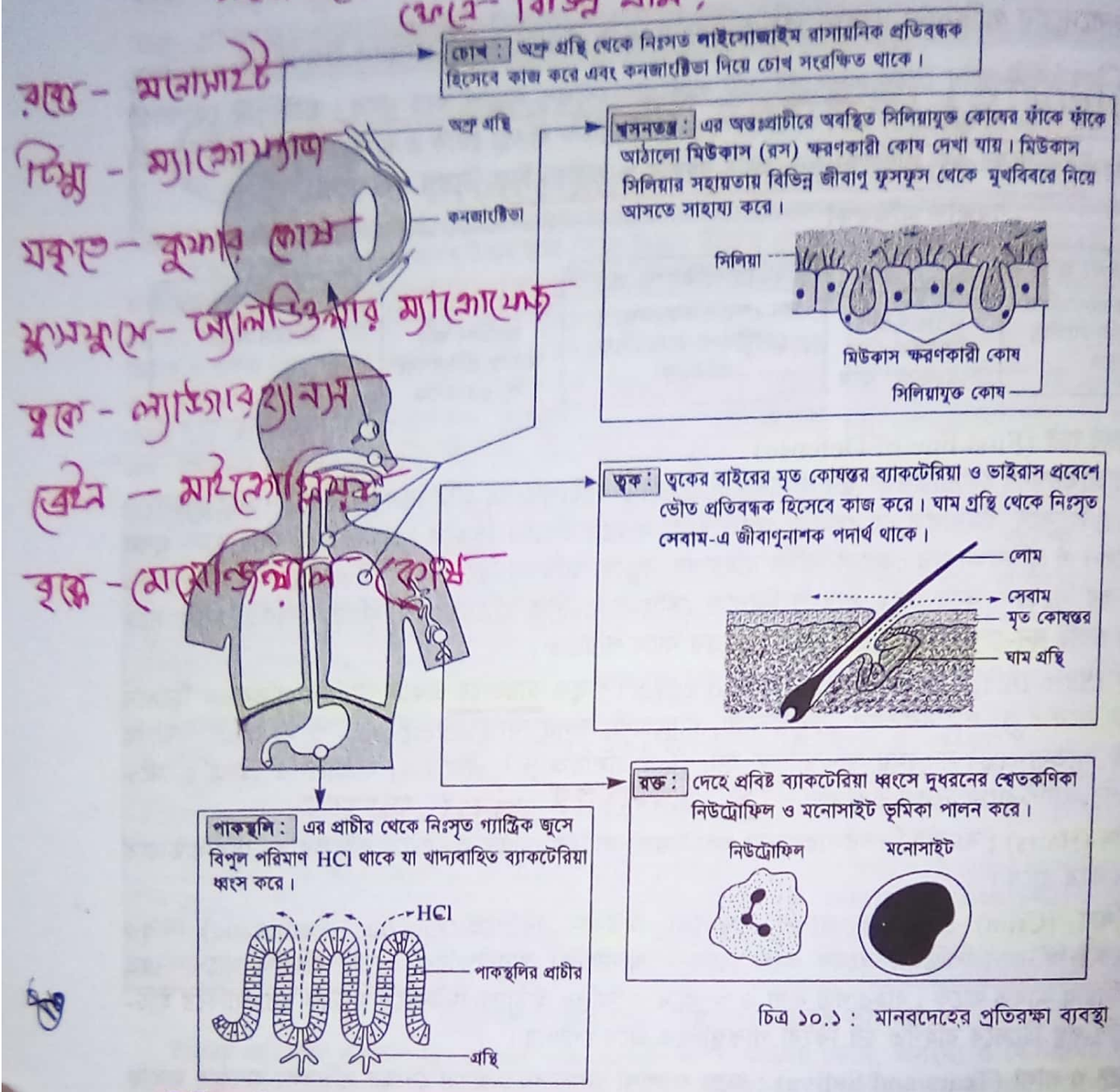

চিত্র ১০.১ : মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

২. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)

বাহ্যিকতলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী যে কোনো অণুজীব বা অণুকণার বিরুদ্ধে দেহাভ্যন্তরীণ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা (internal cellular and chemical defenses) নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাকে **দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এটিও একটি **নন-স্পেসিফিক** প্রতিরক্ষা স্তর। নিচে বর্ণিত অন্ততঃ ৬ ধরনের নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত।

ক. **ফ্যাগোসাইট** (Phagocytes) : বড় আকারের শ্বেত রক্তকণিকা যা অণুজীব, অন্য কোষ ও বহিরাগত কণা ভক্ষণ করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখে তাকে **ফ্যাগোসাইট** বলে। দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইটিক কণিকা হচ্ছে **নিউট্রোফিল** ও **ম্যাক্রোফেজ**। এগুলো অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। দেহে জীবাণুর সংক্রমণ হলে তার প্রতি সাড়াদান হিসেবে নিউট্রোফিল রক্তে, আর ম্যাক্রোফেজ নির্দিষ্ট টিস্যুতে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু গ্রাস করে (১০.৩ উপঅধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে)। শুধু জীবাণু গ্রাস ও হজম করাই নয়, ম্যাক্রোফেজ পুরনো রক্তকণিকা, মৃত টিস্যু-খন্ড ও কোষীয় ময়লা গ্রাস করে ধাঙ্গর কোষ হিসেবে কাজ করে।

খ. **সহজাত মারণকোষ** (Natural killer cells, সংক্ষেপে NK cells) : এক ধরনের লিম্ফোসাইটজাতীয় বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষের প্লাজমাঝিল্লিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনকে শনাক্ত করে কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয় সেসব কোষকে **সহজাত মারণকোষ** (NK-কোষ) বলে। এগুলো

নন-স্পেসিফিক মারণকোষ (non-specific killer cells)। NK-কোষ ফ্যাগোসাইট নয়, বরং রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে নির্দিষ্ট কোষের প্লাজমাঝিল্লি নষ্ট করে দেয়। NK-কোষের আক্রমণে দ্রুত টার্গেট কোষের ঝিল্লিতে একটি রন্ধ্রের সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিয়াসটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

গ. **প্রদাহ** (Inflammation) : টিস্যুর যে কোনো ধরনের ক্ষতি হলে (যেমন– সংক্রমণজনিত, দহন, যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক বা আঘাতজনিত দৈহিক ক্ষত ইত্যাদি) যে ধারাবাহিক ঘটনার শুরুতে– (i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায়, (ii) পরে গরম হয়, (iii) ফুলে যায় এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায় তাকে সম্মিলিতভাবে **প্রদাহ-সাড়া** (inflammatory response) বা **প্রদাহ** বলে।

রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। হিস্টামিনের উপস্থিতির জন্য কৈশিকনালির প্রাচীর বেশি ভেদ্য হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাচীর ভেদ করে অসংখ্য নিউট্রোফিল ও অনেক উপকারী উপাদানসহ (যেমন - রক্তজমাটের ফ্যাক্টর, O_2 ও পুষ্টি পদার্থ ইত্যাদি) তরল পদার্থ রক্তপ্রবাহে মুক্ত হয়। ফলে ক্ষতস্থান ফুলে উঠে। নিউট্রোফিল রোগ সৃষ্টির জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ ও মৃতকোষ ভক্ষণ শুরু করে। এ সময় ম্যাক্রোফেজ আবির্ভূত হয়ে দ্রুত এসব পদার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিআক্রমণে নিযুক্ত হয়।

ঘ. **কমপ্লিমেন্ট-সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট** (Complement system or Complement) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে অন্ততঃ ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি গ্রুপ যা রক্তে সংবহিত হয়ে অন্যান্য প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সহায়তা করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব প্রোটিন নিষ্ক্রিয়ভাবে সংবহিত হয়। একবার যদি কোনো প্রোটিন সক্রিয় হয়ে উঠে তাহলে তা আরেকটি প্রোটিনকেও সক্রিয় করে তুলে। এভাবে সমস্ত প্রোটিন পরস্পরকে সক্রিয় করে স্পেসিফিক ও নন-স্পেসিফিক উভয় ধরনের প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে উসকে দেয়। ফলশ্রুতিতে NK-কোষ দক্ষতার সঙ্গে টিউমার কোষ ধ্বংস করে; নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ দ্রুত ক্ষতস্থানে পৌঁছায়; অণুজীবের গায়ে কমপ্লিমেন্ট আটকে থেকে নিট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে (চিনিয়ে দেয়); এবং রক্তবাহিকার প্রসারণ ঘটিয়ে প্রদাহ ত্বরান্বিত করে।

ঙ. **ইন্টারফেরন** (Interferon) : ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে যে বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয় তাকে **ইন্টারফেরন** বলে। ইন্টারফেরন ব্যাপিত হয়ে আশপাশের সুস্থ কোষে ছড়িয়ে পড়ে, ঐসব কোষের ঝিল্লিতে যুক্ত হয় এবং সুস্থ কোষগুলোকে এ ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ভাইরাসের পক্ষে অন্য সুরক্ষিত কোষগুলোতে আক্রমণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইনফেরন ক্ষরণ অন্যতম নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য যেহেতু জীবিত কোষের প্রয়োজন হয় তাই সজীব কোষগুলো দ্রুত সাড়া দিয়ে ইন্টারফেরনের সুরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলে।

চ. **জ্বর** (Fever): দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ অস্ত্র হচ্ছে জ্বর। দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (97—99°F অর্থাৎ 36–37.2°C) চেয়ে বেশি হলে তাকে **জ্বর** বলে। ম্যাক্রোফেজ যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত কণাকে শনাক্ত ও আক্রমণ করে তখন কোষগুলো রক্তপ্রবাহে **পাইরোজেন** (pyrogen) নামক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে। পাইরোজেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতর মাত্রায় নির্ধারণ করায়। তখন শরীর কেঁপে উঠে ও জ্বর আসে। জ্বরমাত্রই ক্ষতিকর নয়। কম বা মাঝারি ধরনের জ্বর (102 — 104°F) দেহের উপকারই করে। এমন জ্বরে দেহের ভেতরে জীবাণু তেমন সুবিধা পায় না, বরং সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের যুদ্ধ করার সক্ষমতা বেড়ে যায়। জ্বর হলে দেহকোষের বিপাকীয় হার বেড়ে যায়, প্রতিরক্ষা পদ্ধতি ও টিস্যুর ক্ষয়পূরণ দ্রুততর হয়। জ্বরশেষে ম্যাক্রোফেজগুলো পাইরোজেন ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়, দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। যে জ্বর দুদিনের বেশি স্থায়ী হয়, কিংবা 100°F ছাড়িয়ে যায় তখনই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৩. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third line of Defense)

যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যে কোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া দেয় তাকে **তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এ স্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ডটি **ইমিউন সাড়া** (immune response) নামে পরিচিত।

বহিরাগত অণুজীব বা কণা কোনোভাবে ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে (অর্থাৎ সমস্ত নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পেরিয়ে) দেহে অনুপ্রবিষ্ট হলে প্রতিরক্ষা স্তরের সর্বোত্তম, সক্রিয়, শক্তিশালী ও স্থায়ী অনাক্রম্য সাড়ার সম্মুখীন হয়। এ সাড়া নিম্নোক্ত **৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত** :

ক. বহিরাগত অণুজীব বা কণা শনাক্ত করে টার্গেটে পরিণত করতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যবান কোষকে অসুস্থ (যেমন– ক্যান্সার কোষ) বা মৃতপ্রায় বা মৃতকোষ থেকে পৃথক করতে পারে।

খ. বহিরাগত অণুজীব বা কণার সংক্রমণ 'স্মৃতি'তে ধরে রেখে বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বহিরাগতের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঠেকানোর চেষ্টা করে।

গ. এটি সমগ্র দেহকে রক্ষা করে এবং অনুপ্রবেশকারী উদ্ভূত অনাক্রম্যতা দেহের নির্দিষ্ট অংশে কার্যকর না থেকে শরীরের যে কোনো অংশে কার্যকর হতে পারে।

দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Skin in Defense of the Body)

মানবদেহকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমে দরকার দেহে জীবাণুর প্রবেশ বন্ধ করা। একাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে **ত্বক** (skin) অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কারণে প্রথম সারির প্রতিরক্ষক হিসেবে ত্বক সুপরিচিত। এটি অন্যতম নন-স্পেসিফিক (non-specific) বহিঃস্থ প্রতিবন্ধক। যে প্রতিবন্ধক কোনো জীবিত বস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত না করতে পেরে তাকে জীবাণু মনে করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে ধরনের প্রতিবন্ধককে **অনির্দিষ্ট** বা **নন-স্পেসিফিক প্রতিবন্ধক** বলে। নিচে দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ত্বকের বাইরের স্তরটি **এপিডার্মিস** (epidermis)। এটি একটি হর্ণি স্তর যা মৃত ও চাপা কোষে গঠিত এবং **স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম** (stratum corneum) নামে পরিচিত। এটি জীবাণুরোধী স্তর এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের প্রবেশে **ভৌত প্রতিবন্ধক** (physical barrier) হিসেবে কাজ করে। কতকগুলো ভাইরাস ছাড়া এমন কোনো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নেই যা অক্ষত ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

২. মানবত্বকে অক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই থাকে, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সেখানে বাঁচতে পারে না। কারণ ত্বকের **স্বেদ** বা **সিবেসাস গ্রন্থি** (sebaceous gland) ও **ঘাম গ্রন্থি** (sweat gland) থেকে যথাক্রমে যে **তেল** (বা স্বেদ) ও **ঘাম** ক্ষরিত হয় তা ত্বককে এসিডিক (p^H 3.0-5.0) করে তুলে। এমন পরিবেশে জীবাণু বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, ত্বকে যে সব অক্ষতিকর বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোও যে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য ত্যাগ করে সে সব পদার্থও ত্বকের উপরে ব্যাকটেরিয়া দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। স্বেদ ও ঘাম গ্রন্থির ক্ষরণেও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) পদার্থ থাকে (যেমন –ডার্মিসাইডিন নামে পেপটাইড)। এসব পদার্থ থাকায় মানুষের ত্বক **আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ** (self-disinfecting organ) হিসেবে কাজ করে।

৩. মানুষের দেহগাত্রে স্বাভাবিকভাবে বসবাসরত ব্যাকটেরিয়া অন্যান্য অণুজীবের সংক্রমণ সম্ভাবনা থেকে দেহকে রক্ষা করে। যেমন–যোনিতে যে ব্যাকটেরিয়া বাস করে তা ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে p^H মাত্রা কমিয়ে দেয়। কেউ অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে এসব ব্যাকটেরিয়া মারা যেতে পারে, ফলে যোনিদেশে p^H বেড়ে যায়। এ সুযোগে সেখানে *Candida* বা অন্যান্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে ক্ষতরোগের সৃষ্টি করে।

৪. ত্বক কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ টিস্যুতে সংক্রমণের আশংকা বহুগুণ বেড়ে যায়। কাটা স্থান দিয়ে নির্গত রক্ত জমাট বেঁধে শুধু যে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে তাই না, বাইরে থেকে অণুজীব প্রবেশেও বাঁধা দেয়। দ্রুত ও আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এ প্রাকৃতিক চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর।

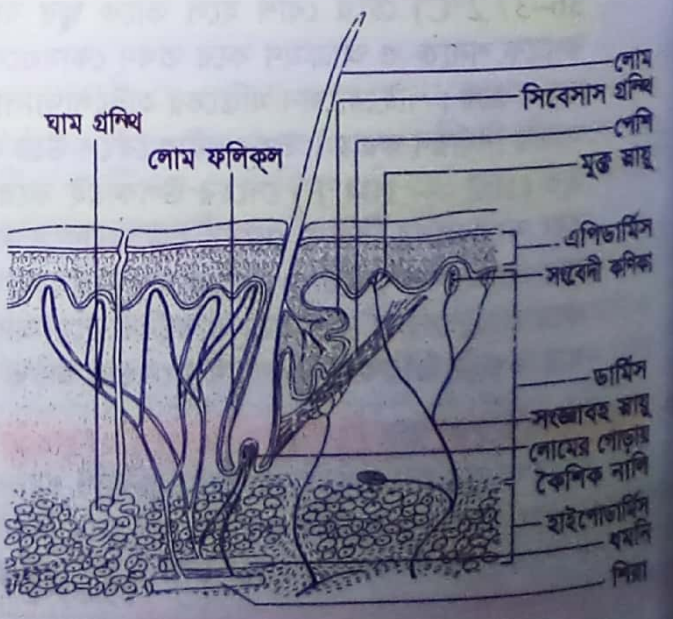

চিত্র ১০.২ : মানুষের ত্বকের অন্তর্গঠন

৫. দেহের সিক্ত অংশগুলো সবসময় কোনো না কোনো ব্যাকটেরীয় সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। অনেক অংশ আবার ব্যাকটেরিয়ানাশকও বহন করে, যেমন–অশ্রু, নাসিকাঝিল্লি ও লালায় **লাইসোজাইম** (lysozyme); সিমেনে **স্পার্মিন** (spermin); দুধে **ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ** (lactoperoxidase) ইত্যাদি।

৬. কানের ভেতরে **সিরুমিনাস গ্রন্থি** থেকে ক্ষরিত **সিরুমেন** বা কানের মোম কানের গভীরে ধূলা-বালি, ব্যাকটেরিয়া ও ছোট পোকার প্রবেশ প্রতিরোধ করে। সিরুমিনাস গ্রন্থি কর্ণকুহরে এক ধরনের ত্বকীয় গ্রন্থি।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Digestive Acid and Enzyme in the Destruction of Bacteria in Food)

আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া (ও ভাইরাস)-এর মুখোমুখি হচ্ছি। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, খাদ্যের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ। বাঁচার জন্যে আহার করি, কিন্তু তা যদি ব্যাকটেরিয়া যুক্ত হয় তাহলে জীবন ধারণই অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিছু ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই খাদ্যবাহিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে বলে আমরা তা টেরও পাই না।

নাসিকা-গহ্বর, গলবিল ও ট্রাকিয়ার মিউকাস ঝিল্লি যে **মিউকাস** ক্ষরণ করে তাতে লাইসোজাইম (lysozyme) ধরনের প্রোটিন থাকে যা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। ট্রাকিয়ার মিউকোসা শুধু মিউকাসই ক্ষরণ র প্রাচীর সিলিয়াময়ও বটে। সিলিয়া থাকায় ধূলা-বালি বা বহিরাগত বস্তু প্রবেশে বাধা পায়, সিলিয়ায় আটকা ং সিলিয়ার বহির্মুখি আন্দোলনে ব্যাকটেরিয়া মিউকাস মিশ্রিত হয়ে গলবিলে এসে পড়ে। গলবিল হয়ে এসব াকটেরিয়া পাকস্থলিতে পৌছালে গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর ক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায়।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও বিভিন্ন এনজাইম নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. লালাগ্রন্থিতে **লাইসোজাইম** নামে এক ধরনের এনজাইম থাকে। এটি মুখ ও গলায় সংক্রমণকারী *Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক ধরনের জীবাণু ধ্বংস করে। ব্যাকটেরিয়ার পলিস্যাকারাইড-নির্মিত কোষপ্রাচীর বিগলিত করে এদের বিনষ্ট করে।

২. লাইসোজাইম, লালা এবং লালায় অবস্থিত সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন (এটি দাঁতে এসিডের উপস্থিতিকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে) মিলে দাঁত ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের ভেতরে বা দাঁতে খাদ্যকণা জমতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়াও জন্মাতে পারে না।

৩. পাকস্থলি প্রাচীরের প্যারাইটাল বা অক্সিনেটিক কোষ-ক্ষরিত গ্যাস্ট্রিক জুসে বিপুল পরিমাণ HCl পাকস্থলির অভ্যন্তরে শক্তিশালী **এসিডিক মাধ্যম** (p^H 1.0–2.0) সৃষ্টি করে। এসিডিক মাধ্যম খাদ্যে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে।

৪. অন্ত্রে বসবাসকারী কয়েক ধরনের মিথোজীবী অণুজীব থেকে ক্ষরিত অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং খাদ্যবাহিত কয়েক ধরনের ভাইরাসের বৃদ্ধি রহিত করে।

৫. যকৃত থেকে ক্ষরিত **পিত্ত** (ক্ষারীয় রস p^H 8.0) অন্ত্রের ডিওডেনামে অবস্থিত **কাইম** (chyme)-এ অ্যান্টিবডি উৎপন্নের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

৬. সমগ্র পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাসে আবৃত থাকে। মিউকাসে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়াকে ঘিরে ধরে এবং প্রাচীরগাত্রে আটকে থাকতে বাধা দেয়।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল-এর ভূমিকা (দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Macrophage and Neutrophils in Destroying Bacteria)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় সদা ব্যস্ত বিভিন্ন শ্বেত-রক্তকণিকা ও রক্তবাহিকা মিলে **দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষক** হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিরক্ষা স্তরকে **নন-স্পেসিফিক অন্তঃস্থ প্রতিবন্ধক** বলে। প্রথম স্তর পেরিয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে দ্বিতীয় স্তর। এ স্তর টিস্যু, রক্তবাহিকা এবং ফ্যাগোসাইট ও লিম্ফোসাইট নিয়ে গঠিত।

দেহে প্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে দুধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ১. **ম্যাক্রোফেজ** ও ২. **নিউট্রোফিল**। নিচে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এদের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

রাশিয়ান বিজ্ঞানী Ilya Mechnikov 1884 সালে ম্যাক্রোফেজ আবিষ্কার করেন।

১. ম্যাক্রোফেজ (Macrophage : গ্রিক *makros* = large : *phagein* = eat, অর্থাৎ big eaters)

মনোসাইট হচ্ছে বৃক্কাকার ও দানাহীন সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত-রক্তকণিকা। দেহের মোট শ্বেত-রক্তকণিকার ৫ শতাংশ মনোসাইট। অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এসব কোষ ১০-২০ ঘন্টা রক্তে সংবহিত হওয়ার পর কৈশিকনালির প্রাচীরের ভিতর দিয়ে টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ফুলতে শুরু করে এবং প্রায় ৫ গুণ বড় হয়ে ৬০-৮০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। পরিণত এ মনোসাইটকে **ম্যাক্রোফেজ** বলে ; কিছু ম্যাক্রোফেজ সারা শরীরে পরিভ্রমণ করে, অন্যগুলো স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট টিস্যুতে (যেমন- ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক, যোজক টিস্যু, মস্তিষ্ক ও বিশেষ করে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহা) অবস্থান নেয়। প্রয়োজনে এখানে ম্যাক্রোফেজ ৪০ মাইক্রোমিটার / মিনিট গতিতে ক্ষণপদীয় চলনের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয় এবং বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে।

ম্যাক্রোফেজ দেহে প্রবিষ্ঠ বিজাতীয় পদার্থের প্রতি ইমিউন সাড়াদানে মূল ভূমিকা পালন করে। তখন মনোসাইটগুলো টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। ম্যাক্রোফেজের উপস্থিতি দেখেই ধারণা করা যায় যে দেহে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইমিউনতন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ম্যাক্রোফেজ নিউট্রোফিলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ফ্যাগোসাইট হিসেবে কাজ করে। তখন একেকটি ম্যাক্রোফেজ প্রায় ১০০টির মতো ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে, কখনওবা সম্পূর্ণ লাল-রক্তকণিকা, ছত্রাক বা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মতো বড় পদার্থও গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজ এসব পদার্থ গ্রহণ ও পরিপাক শেষে অপাচ্য অংশ বহিষ্করণের পরও অনেক সময় জীবিত থাকে এবং আরও কয়েক মাস সক্রিয় থাকে। **সাইটোকাইন** নামক রাসায়নিক বার্তাবাহক ক্ষরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কোষকে একত্রিত করে ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা পালন করে। মানুষের ১লি. রক্তে প্রায় 5 বিলিয়ন নিউট্রোফিল থাকে।

২. নিউট্রোফিল (Neutrophils) সর্বোচ্চ ৫ দিন বাচে।

নিট্রোফিল হচ্ছে ১২-১৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসসম্পন্ন, ২-৫ খন্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত (খন্ডগুলো পরস্পরের সাথে সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে যুক্ত) ও সূক্ষ্ম দানাময় সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার ৬০-৭০ শতাংশই নিউট্রোফিল। এসব কণিকা ক্ষণপদীয় চলন প্রদর্শন করে (৪০ মাইক্রোমিটার/মিনিট) এবং অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়। একজন স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষে দৈনিক প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) নিউট্রোফিল উৎপন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে পরিণত নিট্রোফিলে রূপ নেয়। এগুলো ক্ষণস্থায়ী রক্তকণিকা, রক্ত প্রবাহে প্রবেশের পর ১২ ঘন্টা থেকে ৩ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে টিস্যুতে প্রবেশ করলে কিছুদিন বেশি বাঁচে। কণিকাগুলো যেহেতু ক্ষণজীবী তাই দেহের সুরক্ষায় কখন এসব কণিকার প্রয়োজন পড়ে সে কারণে বিপুল সংখ্যক নিউট্রোফিল অস্থিমজ্জায় সব সময় মজুদ থাকে। অস্থিমজ্জার বাইরে সংবহিত ১০০ বিলিয়ন নিউট্রোফিলের মধ্যে অর্ধেক থাকে টিস্যুতে, বাকি অর্ধেক রক্ত বাহিকায়। যেগুলো রক্তবাহিকায় থাকে তার অর্ধেক থাকে মূল ও দ্রুত রক্তস্রোতে, বাকি অর্ধেক চলে ধীরে সুস্থে রক্তবাহিকার অন্তপ্রাচীর ঘেঁষে (সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন টিস্যুতে প্রবেশ করতে পারে)।

নিউট্রোফিল হচ্ছে সক্রিয় ফ্যাগোসাইটিক শ্বেত-রক্তকণিকা। এগুলো বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা যে কোনো আণুবীক্ষণিক প্রোটিন কণা গ্রাস করে নেয়। কণিকার অভ্যন্তরে লাইসোজোম যে সক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ধারণ করে রাখে তার সাহায্যে গৃহীত বস্তু ধ্বংস করে। নিউট্রোফিলের পক্ষে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে বড় পদার্থকে গ্রাস করা সম্ভব হয় না। একটি নিউট্রোফিল ৩-২০ টি ব্যাকটিরিয়া গ্রাস করতে পারে। এরপর সেটি নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ফ্যাগোসাইটোসিস

(Phagocytosis : গ্রিক *phagein* = to eat; *kytos* = cell; *oisis* = process : **কোষভক্ষণ প্রক্রিয়া)**

যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা দেহরক্ষার অংশ হিসেবে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে দেহে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি) বা টিস্যুর মৃতকোষ ও অন্যান্য বহিরাগত কণাকে গ্রাস ও এনজাইমের সাহায্যে ধ্বংস করে দেহকে আজীবন সুস্থ রাখতে সচেষ্ট থাকে তাকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** বলে। ইমিউনতন্ত্রের প্রধানতম কাজ হচ্ছে সমন্বিত ও কার্যকর ফ্যাগোসাইটোসিস চালু রাখা।

ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ (Steps of Phagocytosis)

সম্পূর্ণ ফ্যাগোসাইটোসিস জুড়ে এমন জৈবরাসায়নিক, জৈবপদার্থবিজ্ঞান-এর কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে যার ফলে এ প্রক্রিয়ার সুচিন্তিত ধাপ শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনার সুবিধার জন্য ফ্যাগোসাইটোসিসকে নিচেবর্ণিত ৭টি ধাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

১. **ম্যাক্রোসাইটের সক্রিয় হওয়া** (Activation of macrocytes) : জীবাণু সংক্রমণের ফলে প্রদাহস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু বা রক্তজমাট থেকে উৎপন্ন কাইনিন, হিস্টামিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস ইত্যাদি রাসায়নিকে উদ্দীপ্ত হয়ে

ম্যাক্রোসাইটগুলো (ম্যাক্রোফেজ/ নিউট্রোফিল) কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে ক্ষতস্থানে অভিযাত্রী হয়। ম্যাক্রোসাইটগুলো যখন সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ক্ষতস্থানে জড়ো হতে থাকে সে প্রক্রিয়াকে বলে **কেমোট্যাক্সিস** (chemotaxis)।

২. **অণুজীব ভক্ষণ** (Ingestion) : সক্রিয় হওয়ার পর ক্রমশঃ অণুজীবের দেহতলের সংস্পর্শে এলে ফ্যাগোসাইটে (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল) দ্রুত যে ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ সৃষ্টি করে অণুজীব ভক্ষণে উদ্যত হয় এবং মাত্র ০.০১ সেকেন্ডে একটি ব্যাকটেরিয়াম ভক্ষণ সম্পন্ন করতে পারে।

৩. **ফ্যাগোজোম সৃষ্টি** (Formation of phagosome) : অণুজীব ভক্ষণের উদ্দেশে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ বের করে ব্যাকটেরিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং ক্ষণপদের মাঝে সৃষ্ট গহ্বরে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ করে। দুদিক থেকে আসা ক্ষণপদের অগ্রভাগ আরো এগিয়ে পরস্পর একীভূত হয়। এভাবে সৃষ্ট ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকাটি **ফ্যাগোজোম** নামে পরিচিত। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অ্যাকটিন ও অন্যান্য সংকোচনশীল তন্তু ফ্যাগোজোমের চতুর্দিক ঘিরে রাখে। এসব তন্তুর সংকোচনে ফ্যাগোসাইটের ঝিল্লি থেকে ফ্যাগোজোম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকার মতো চালিত হয়।

৪. **ফ্যাগোলাইসোজোম সৃষ্টি** (Formation of phagolysosome) : আবদ্ধ ব্যাকটেরিয়াসহ ফ্যাগোজোম সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে পরিযায়ী হয়। এ সময় সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত গোল, ঝিল্লিবেষ্টিত ও হাইড্রোলাইটিক এনজাইমপূর্ণ দুএকটি **লাইসোজোম** নামক কোষ–অঙ্গাণু ও অন্যান্য সাইটোপ্লাজমিক দানা ফ্যাগোজোমের ঝিল্লির সঙ্গে একীভূত হয়। একীভূত লাইসোজোম থেকে ব্যাকটেরিয়ানাশক (bactericidal agents) ও পরিপাক এনজাইম (digestive enzyme) ফ্যাগোজোমে ক্ষরিত হয়। ফ্যাগোজোমটি তখন ঝিল্লিবেষ্টিত একটি **পরিপাক থলিকা** (digestive vesicle)-য় পরিণত হয়। থলিকাটিকে **ফ্যাগোলাইসোজোম** বলে।

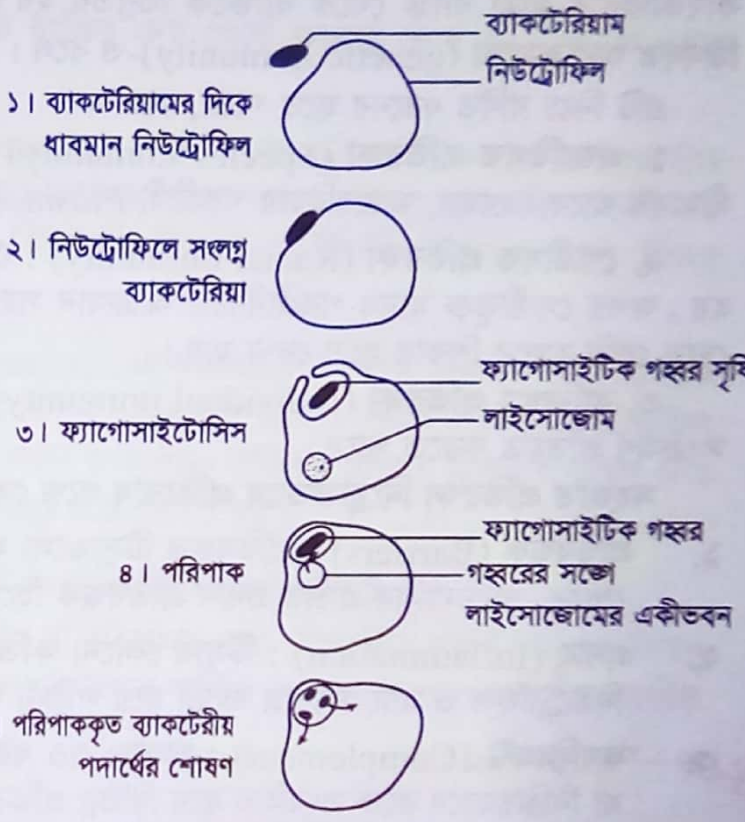

চিত্র ১০.৩ : ফ্যাগোসাইটোসিস-এর ধাপসমূহ

৫. **ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকোষীয় মরণ ও পাচন** (Intracellular killing and digestion of bacteria): ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস ও পরিপাকের জন্য লাইসোজোম ফ্যাগোজোমের সঙ্গে একীভূত হয়ে দুধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। গ্রাসের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাকটেরিয়ার চলন, রেচন, জননসহ যাবতীয় কার্যকলাপ বৃদ্ধ হয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য বহিরাগত প্রোটিন অণুকে হজম করার জন্য ফ্যাগোসাইটের লাইসোজোম থেকে বিপুল পরিমাণ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ক্ষরিত হয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া পরিপাকে এসব এনজাইম যথেষ্ট। অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ এনজাইম কার্যকর হয়, ব্যর্থ হলে যক্ষ্মার মতো অসুখের সৃষ্টি হতে পারে।

৬. **অপাচ্য অংশসহ ব্যাকটেরিয়ার অবশেষ** (Residual body containing indigestible materials): ফ্যাগোজোম ঝিল্লিবেষ্টিত পরিপাক গহ্বর হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস বা হজমের কোনো পর্যায়ে ক্ষতিকর কোনো অংশ ফ্যাগোলাইসোজোমের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে না। তবে উপযুক্ত পুষ্টি পদার্থ উৎপন্ন হলে তা ফ্যাগোজোমের সাইটোপ্লাজমে শোষিত হয়।

৭. **বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন** (Discharge of waste materials) : বেশি সংখ্যক ব্যাকটোরিয়া গ্রাস করায় এবং তা পরিপাকের পর বর্জিত বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চয় বা লাইসোজোমের ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পদার্থ সঠিকভাবে ফ্যাগোজোমে পতিত না হয়ে ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হওয়ায় প্রতিটি নিউট্রোফিলই মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে, ম্যাক্রোফেজ উৎপন্ন বিষাক্ত ও অপাচ্য অংশ ত্যাগ করে নতুন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে তৎপর হয়।

সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা (তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর) (The Innate & Acquired immunity)

মানবদেহকে রোগাক্রান্ত করতে সর্বশেষ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জীবাণুকে পরাস্ত করতে হয় সেটি হচ্ছে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর। বিজ্ঞানী A.C. Gyton and J. E. Hall তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুভাগে ভাগ করেন। যেমন- **সহজাত প্রতিরক্ষা** (Innate or Inborn Immunity) এবং **অর্জিত প্রতিরক্ষা** (Acquired Immunity)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

সহজাত প্রতিরক্ষা (Innate Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা বা অনাক্রমতা অমরার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও জন্মের সময় থেকে আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষায় দ্রুত কার্যকর হয় তাকে **সহজাত প্রতিরক্ষা** বলে। সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নির্দিষ্ট। অর্থাৎ মানব প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যে একই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো রয়েছে যদি তার কার্যকারিতার মাত্রা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিকে ভিন্নতর হয়। জিনগত স্বরূপ এবং উপর সৃষ্ট বলে এ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে **জিনগত অনাক্রম্যতা** (genetic immunity)-ও বলে।

এটি নিচে বর্ণিত ধরনের হতে পারে, যেমন-

১. **প্রজাতিগত প্রতিরক্ষা** (Species immunity) : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরজীবীর আক্রমণ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, ম্যালেরিয়ার পরজীবী *Plasmodium vivax* মানুষ ও *immunity* মশকীর উপর পরজীবী।

২. **গোষ্ঠীগত প্রতিরক্ষা** (Racial immunity) : কোন বিশেষ পরজীবী দ্বারা মানুষের কোন কোন গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়। অপর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ পরজীবীটির আক্রমান সহজেই প্রতিরোধ করে। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা শ্বেতাঙ্গ মানুষির চেয়ে বেশি যক্ষার শিকার হতে দেখা যায়।

৩. **ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা** (Individual immunity) : কোন কোন মানুষ নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পরজীবীর সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

সহজাত প্রতিরক্ষা নিম্নোক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

১. **প্রতিবন্ধক** (Barriers) : প্রতিবন্ধক টিস্যুগুলো হচ্ছে ত্বক, পৌষ্টিকনালি, শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে জননালির প্রাচীর প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

২. **প্রদাহ** (Inflammation) : টিস্যুর কোনো ক্ষতি হলে মাস্টকোষের তৎপরতায় নানা ধরনের কণিকা বিশেষ করে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ জড়ো হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান ঘটে।

৩. **কমপ্লিমেন্ট** (Complement) : অন্তত: ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্ত:- সম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিতে সাহায্য করে তাকে **কমপ্লিমেন্ট** বলে। সক্রিয় হলে অণুজীবের প্লাজমাঝিল্লিতে আটকে থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে, কিংবা কোষধ্বংসে অংশ গ্রহণ করে।

৪. **ইন্টারফেরন** (Interferon) : ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন নামক বিশেষ ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়ে দেহকোষকে রক্ষা করে।

৫. **সহজাত মারণকোষ** (Natural killer cells) : এগুলো লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ শ্বেত-রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে।

৬. **সহজীবী ব্যাকটেরিয়া** (Symbiotic bacteria) : পরিপাকতন্ত্র, ত্বক ও নারীদের জননতন্ত্রে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে। এগুলো ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন কোলনে বাসকারী ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন B ও k সংশ্লেষ করে)। কিছু অণুজীব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুর বৃদ্ধি রহিত করে দেয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষা (Acquired Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মসময় থেকে নয়, বরং জন্মের পর কোনো নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে **অর্জিত প্রতিরক্ষা** বলে। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি **স্পেসিফিক ইমিউনিটি** (specific immunity)। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুরকম : **(ক) সক্রিয় প্রতিরক্ষা** এবং **(খ) অক্রিয় প্রতিরক্ষা**।

ক. সক্রিয় প্রতিরক্ষা (Active Immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে দেহের কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এটি দুধরনের- **প্রাকৃতিক** ও **কৃত্রিম**।

i. **প্রাকৃতিক সক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Natural Active Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় অনিচ্ছাকৃত জীবাণুর সংস্পর্শে আসায় সংক্রমণ ঘটে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। যেমন-হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সংক্রমণ। এ ধরনের প্রতিরক্ষা দীর্ঘদিন থাকে, কখনওবা আজীবন থাকে।

ii. **কৃত্রিম সক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Artificial Active Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ভ্যাক্সিনেশনের পর জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। যেমন-**DPT ভ্যাক্সিন** ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুস্টংকার) ও পারটাসিস (হুপিংকাশি)-এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলে।

খ. অক্রিয় প্রতিরক্ষা (Passive Immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে অ্যান্টিবডি এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্যের দেহে বা প্রাণিদেহ থেকে মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

i. **প্রাকৃতিক অক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Natural Passive Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় অমরা বা কলোস্ট্রাম (শাল দুধ)-এর মাধ্যমে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে শিশুদেহে প্রবেশ করে। এভাবে স্থানান্তরিত অ্যান্টিবডি কয়েক সপ্তাহমাত্র টিকে থাকে। এ সময়ের মধ্যে শিশুদেহে নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্নের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষাতন্ত্র গড়ে উঠে।

ii. **কৃত্রিম অক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Artificial Passive Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে অ্যান্টিবডি প্রবেশ করানো হয়। যেমন-রোগ ভোগের পর সেরে ওঠা ব্যক্তির সিরাম আক্রান্ত অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করানো। কোথাও একটি নতুন বা অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং সে মুহূর্তে সঠিক চিকিৎসার অভাবে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপসমূহ (Steps of Acquired Immunity)

-নির্ভর প্রতিরক্ষা ও অ্যান্টিবডি-নির্ভর প্রতিরক্ষায় অণুজীব বা বহিরাগত কণা (বিজাতীয় পদার্থ) ধ্বংসে বিভিন্ন বহুত হলেও সাধারণ ধাপ উভয় ক্ষেত্রেই এক রকম। সাধারণভাবে অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপগুলো নিচে বর্ণিত রোনামের অধীনে ব্যাখ্যা করা যায়।

ইন্টারলিউকিন, ইন্টারফেরন, গ্রোথ ফ্যাক্টর প্রভৃতি সাইটোকাইন।

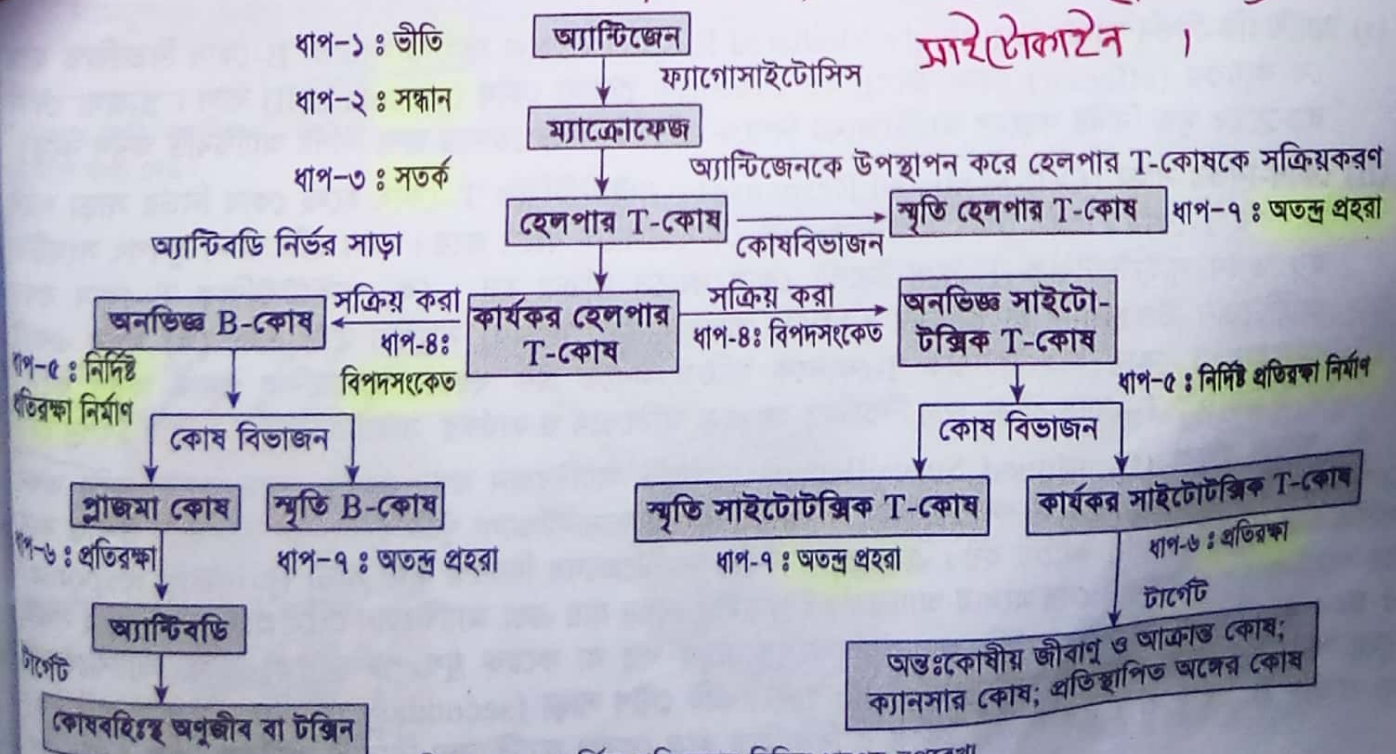

চিত্র ১০.৪ : অর্জিত প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ধাপের রূপরেখা

১. **ভীতি** (Threat) : যখন MHC (Major Histocompatibility Complex) পরিচয়বিহীন একটি অণু বা অণুজীব (অ্যান্টিজেন) প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে দেহে প্রবেশ করে তখন থেকেই অর্জিত প্রতিরক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

২. **সন্ধান** (Detection) : ম্যাক্রোফেজ জাতীয় ফ্যাগোসাইটিক কোষ সারাদেহে সংবহিত হয় এবং চলার পথে বহিরাগত পদার্থ বা অণুজীব পেলে গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে ভক্ষিত পদার্থ পরিপাকের পর অতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

৩. **সতর্ক** (Alert) : দেহে একটি অ্যান্টিজেন রয়েছে তা বোঝানোর জন্যে পরিপাককৃত বহিরাগত পদার্থের কিছু কণা ম্যাক্রোফেজের প্লাজমাঝিল্লিতে MHC স্বচিহ্নিতকারী অংশে বাহিত হয়। ফলে ইমিউনতন্ত্রের প্রধান কোষ হেলপার T-কোষ সতর্ক হয়ে যায়। এভাবে ম্যাক্রোফেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ **অ্যান্টিজেন-উপস্থাপক কোষ** (antigen-presenting cell, সংক্ষেপে APC) হিসেবে কাজ করে। লসিকা গ্রন্থির B-কোষ ও ডেন্ড্রাইটিক কোষ নামক আরও দুধরনের কোষ APC হিসেবে কাজ করে। ম্যাক্রোফেজ সঠিক ধরনের রিসেপ্টরযুক্ত হেলপার T–কোষের কাছে অ্যান্টিজেনকে উপস্থাপন করে। T–কোষ সমগ্র অর্জিত প্রতিরক্ষা সাড়ার মেইন সুইচের মতো কাজ করে এবং সঠিক হেলপার T–কোষ না পাওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিজেন নিয়ে পরিভ্রমণ করে। সঠিক T–কোষ পেলে ম্যাক্রোফেজ তার সাঙ্গে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, ফলে T–কোষ উদ্দীপ্ত হয়।

৪. **বিপদসংকেত** (Alarm) : কয়েক ঘন্টার মধ্যে সক্রিয় হেলপার T–কোষ তার নিজস্ব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সেই ক্ষরণে উদ্দীপ্ত সঠিক B-কোষ ও সাইটোটক্সিক T–কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে আটকাতে এগিয়ে আসে।

৫. **নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণ** (Building Specific Defense) : উদ্দীপ্ত সঠিক B–কোষ ও T–কোষগুলো সক্রিয় হয়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে শুরু করে, ফলে জিনগত সদৃশ কোষগুচ্ছ গড়ে ওঠে। এর নাম **ক্লোন** (clon)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রত্যেক মানবদেহে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি (১০ কোটির বেশি) লিম্ফোসাইট ক্লোন রয়েছে। ক্লোনে দুধরনের কোষ সৃষ্টি হয়। এক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় হয়ে দেহরক্ষায় কাজ করে। এগুলোকে **কার্যকর কোষ** (effector cells) বলে। আরেক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট ঐ অ্যান্টিজেনের স্মৃতি বহন করে ভবিষ্যতে ঐ অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এসব কোষের নাম **স্মৃতি কোষ** (memory cells)। যে প্রক্রিয়ায় এমন বিশেষায়িত ক্লোনের সৃষ্টি হয় তাকে **ক্লোনাল সিলেকসন** (clonal selection) বলে।

৬. **প্রতিরক্ষা** (Defense) : অর্জিত প্রতিরক্ষায় দুধরনের প্রতিরক্ষা সাড়া (immune response)-র মাধ্যমে মানবদেহে প্রতিরক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে।

(i) **অ্যান্টিবডি-নির্ভর সাড়া** (Antibody-Mediated Response) : এ ধরনের সাড়ায় B-কোষ বিভাজিত হয়ে যে কার্যকর (effector) কোষ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে **প্লাজমা কোষ** (plasma cell) বলে। প্লাজমা কোষ রক্তস্রোতে মুক্ত নির্দিষ্ট গড়নের অ্যান্টিজেনের বিপক্ষে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।

(ii) **কোষ-নির্ভর সাড়া** (Cell-Mediated Response) : সাইটোটক্সিক T–কোষ হচ্ছে কোষ নির্ভর সাড়া দানে কার্যকর T-কোষ। এসব কোষ অ্যান্টিজেনবাহী কোষগুলোকে ধ্বংস করে। যখন ২টি ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত হয় তখন সাইটোটক্সিক T-কোষ টার্গেট কোষ ধ্বংসে সক্রিয় হয় : (ক) সাইটোটক্সিক T–কোষ যখন অ্যান্টিজেন উপস্থাপনকারী কোষের (APC, যেমন-ম্যাক্রোফেজের) সম্মুখীন হয়; এবং (খ) যখন একটি হেলপার T-কোষ সাইটোটক্সিক T-কোষকে সক্রিয় করতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সাইটোটক্সিক T–কোষ সক্রিয় হলে বিভাজিত হয় এবং স্মৃতিকোষ ও কার্যকর সাইটোটক্সিক T– কোষ উৎপন্ন হয়।

৭. **অতন্দ্র প্রহরা** (Continued Surveillance) : একটি অ্যান্টিজেন যখন প্রথমে দেহে প্রবেশ করে তখন কয়েকটিমাত্র লিম্ফোসাইট সেটাকে শনাক্ত করতে পারে। সেই লিম্ফোসাইটগুলো খুঁজে বের করে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে অগণিত লিম্ফোসাইট উৎপন্ন করতে হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে **মুখ্য সাড়া** (primary response) ধীরে সংঘটিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশের ১ বা ২ সপ্তাহ পর চরম মাত্রায় পৌঁছায়। দেহে যদি আবারও (অনেক বছর পর বা কয়েক যুগ পর হলেও) একই অ্যান্টিজেনের অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে সাড়াদান ঘটে দ্রুত ও শক্তিশালী। এটি **গৌণ সাড়া** (secondary response) নামে পরিচিত। মুখ্য সাড়ায় B–কোষ ও T–কোষগুলো উদ্দীপ্ত ও বিভাজিত হয়ে কেবল অ্যান্টিজেন বিরোধী **কার্যকর কোষ** (effector

মানবদেহের প্রতিরক্ষা (Defense of Human Body)

চোখ
অশ্রুতে অবস্থিত লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে।

কান
সিরুমেন ক্ষরিত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রহিত করে।

মুখগহ্বর

ভ্যাক্সিনেশন

মিশ্র ভ্যাক্সিন: MMR (Measeles, Mumps and Rubella) ভ্যাক্সিন।

দেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ সঙ্গত নয় - লিউকেমিয়া বা অন্য কোনো ক্যান্সার আক্রান্ত কিংবা অন্যাক্রম্যতন্ত্রের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

মানুষের ছয়টি রোগের টিকা এখন সহজ প্রাপ্য। এগুলো হলঃ ডিপথেরিয় (Diptheria), হুপিংকাশি (Pertussis), ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus), পোলিও (Polio), হাম, (Measles) ও যক্ষা (Tuberculosis)।

পোলিও টিকা (Polio Vaccine) ঃ

- Enterovirus নামক একটি RNA ভাইরাসের কারণে পোলিও সৃষ্টি হয়।
- বাংলাদেশে **১৯৯৫ সাল থেকে পোলিওমুক্তকরণ কর্মসূচী** বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ অনেকটা পোলিওমুক্ত।

ডিপিটি টিকা (**DPT Vaccine**) ঃ

- ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি (Pertussis) এবং ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) এ তিনটি রোগের জন্য ডিপিটি টিকা দেয়া হয়।
- ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টাঙ্কার রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া যথাক্রম- Corynebacterium diptheriae ও Clostridium tetani নিঃসৃত টক্সিন এবং হুপিং কাশির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার (Bordetella pertussis) কোষকে একত্রে নিষ্ক্রিয় করে এ টিকা তৈরি করা হয়।

বিসিজি টিকা (BCG vaccine) ঃ

- মানুষের যক্ষা রোগের (Mycobacterium tuberculosis) বিরুদ্ধে এ টিকা ব্যবহৃত হয়।
- বোভিন (গরু জাতীয় প্রাণী) এর দেহে যক্ষা সৃষ্টিকারী ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়াকে (Mycobacterium bovis) জীবন্মৃত (Attenuated) কর এ টিকা তৈরি করা হয়।
- ব্যাকটেরিয়ার ধরন, এ জীবাণু আবিষ্কারক ফরাসি বিজ্ঞানী Albert Calmette এবং Cammillle Guerin এর নামনুসারে টিকার নাম বিসিজি (BCG-Bacille Calmette Guerin) করা হয়েছে।

পায়ু
মিউকাস ঝিল্লি অণুজীবের প্রবেশে বাধা দেয়।

চিত্রঃ মানবদেহের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা স্তর

একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সারাজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে;
২। সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়;
৩। রোগের সংক্রমণ রোধ করে;
৪। খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়;
৫। সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

চিত্র ঃ ত্বকের অন্তর্গঠন

চিত্র ঃ ম্যাক্রোফেজ

চিত্র ঃ নিউট্রোফিল

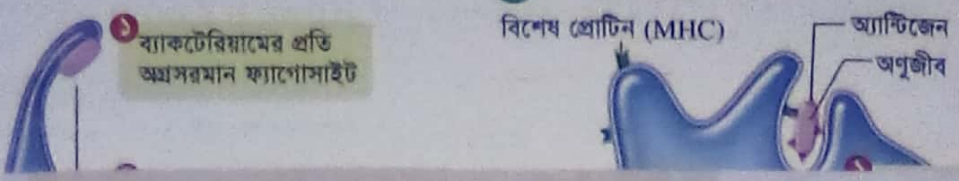

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া

অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ-হয় তাকে **ইপিটোপ (epitope)** বা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেন্ট বলে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন-

১। **অ্যাগ্লুটিনেশন** ঃ এ বিক্রিয়া ঘটানের জন্য IgM বিশেষ কার্যকরি, তবে IgG দ্বারা মৃদু বিক্রিয়া ঘটতে পার।

২। **অপসোনাইজেশন**

৩। **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়তা** ঃ অ্যান্টিবডি IgG ও IgM কমপ্লিমেন্ট সিষ্টেমের বেশ প্রভাবশালী উদ্বুদ্ধক।

৪। **কোষ বিদারণ**

৫। **প্রশমন** : IgG ব্যাকটেরিয়াজাত টক্সিন প্রশমনের বিশেষ উপযোগী।

অনাক্রম্যতার সাড়া দিতে পারে এমন প্রাণিদেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করালে রক্তে **অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে ৩-১৪ দিন সময় লাগে**

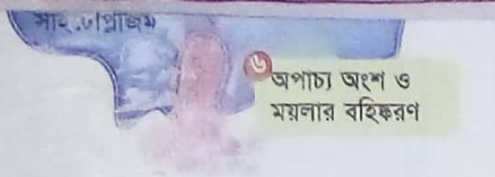

চিত্র ঃ ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ

চিত্র ঃ কিভাবে একটি ম্যাক্রোফেজ অ্যান্টিজেন-উপস্থাপনকারী কোষে পরিণত হয়

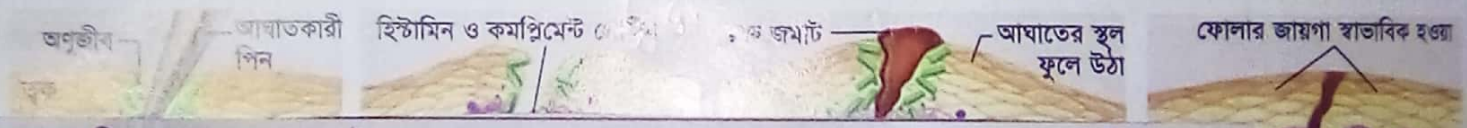

মানবদেহের লিম্ফয়েড অঙ্গগুলো দুই রকম যথাঃ-

A) **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ:**

i. থাইমাস গ্রন্থি - শ্বাসনালির পাশে অবস্থিত।
ii. অস্থিমজ্জা
iii. লসিকা
iv. লসিকা বাহু

B) **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ:**

i. **অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি** (Adenoids) ঃ নাসিকা নালীর পেছনে অবস্থিত দুটি গ্রন্থি
ii. **অ্যাপেনডিক্স** (Appendix) ঃ বৃহদান্ত্রের সাথে যুক্ত নলাকার গঠন বিশেষ
iii. **রক্তনালী সমূহ** (Blood vessels) ঃ দেহের সর্বত্র বিস্তৃত শিরা, ধমনী ও কৈশিক জালিকাসমূহ
iv. **পেয়ার প্যাচ** (Peyer's patches) ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান লসিকা কলা
v. **প্লীহা** (Spleen) ঃ উদর গহ্বরে বিদ্যমান মুটি আকারের গঠন
vi. **টনসিল** (Tonsil) ঃ গলার পেছনে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন
vii. **লসিকা গ্রন্থি** (Lymph node)

[Ref: Dr. A

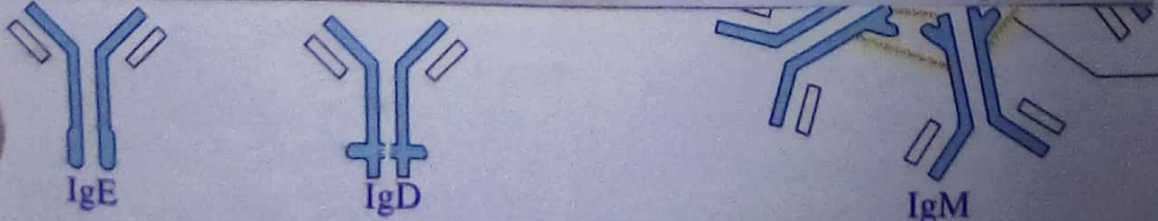

চিত্র ঃ বিভিন্ন অ্যান্টিবডির গঠন

...) সৃষ্টি করে না, বরং **স্মৃতি কোষ** (memory cells)ও উৎপন্ন করে। স্মৃতি কোষ অনেক বছর, এমন কি কয়েক ...পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দেওয়ার মতো দক্ষ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা থাকে ...শি, সাড়া হয় প্রচন্ড ও দ্রুত। দু'তিন দিনের মধ্যে কার্যকর (effectors) কোষের সংখ্যা চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়।

সহজাত প্রতিরক্ষা	অর্জিত প্রতিরক্ষা
১. জন্ম থেকেই এ প্রতিরক্ষা কাজ করে অর্থাৎ এটি জিনঘটিত।	১. এটি জন্মের পরে অর্জিত হয়।
২. রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই এ প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে।	২. রোগভোগ অথবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে এ প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে।
৩. জীবাণু প্রবেশের কয়েক মিনিট বা ঘন্টার মধ্যে সাড়া দেয়।	৩. অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি পাওয়ার ৫–১৪ দিন পর সাড়া প্রদান করে।
৪. ফ্যাগোসাইটস, কিলার কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ প্রধান কোষীয় উপাদান।	৪. B- লিম্ফোসাইট ও T- লিম্ফোসাইট প্রধান কোষীয় উপাদান। সারাজীবন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা
(Role of Antibody in Immune System)

দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র (immune system) থেকে উৎপন্ন এক ধরনের দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন যা রোগ-ব্যাধি ...কারী নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে (যেমন-ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে তাকে **অ্যান্টিবডি** বলে। প্রত্যেকটি অ্যান্টিবডি ...ছে **ইমিউনোগ্লোবিউলিন** (সংক্ষেপে Ig) নামে বিশেষ ধরনের এককেকটি প্রোটিন অণু।

শ্বেত-রক্তকণিকার অন্যতম প্রধান কণিকা হচ্ছে **লিম্ফোইট**। লিম্ফোসাইট দুধরনের : (১) **T-কোষ** ও (২) **B-কোষ**। ...-লিম্ফোসাইট কয়েক উপধরনে বিভক্ত যার একটি হচ্ছে **প্লাজমা B-কোষ**, সংক্ষেপে **প্লাজমা কোষ** নামে পরিচিত। ...াজমা কোষ থেকে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনে প্রত্যেক প্লাজমা কোষ প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার অ্যান্টিবডি ...উৎপন্ন করতে পারে। মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে।

অ্যান্টিবডির গঠন (Structure of Antibody)

প্রত্যেক অ্যান্টিবডির মৌলিক গঠন এক। গাঠনিক অংশগুলো নিম্নরূপ:

১. ভারী ও হালকা শৃঙ্খল (Heavy and Light chains) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুজোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল ...কে। এর মধ্যে সদৃশ একজোড়া লম্বা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ হালকা শৃঙ্খল। ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের ...ণবিক ওজন হচ্ছে যথাক্রমে ৫০–৭০ kD ও 23 kD (kiloDaltons)।

২. ডাইসালফাইড বন্ড (Disulfide bonds) : ...ত্যেক অ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ...াইসালফাইড বন্ড রয়েছে। একটি বন্ড থাকে দুই-ভারী ...শৃঙ্খলের মাঝে, বাকি দুটি থাকে দুপাশে ভারী ও হালকা ...শৃঙ্খলের মাঝে। অ্যান্টিবডির গড়ন দেখতে Y-আকৃতির ... আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ডের সংখ্যা বিভিন্ন ...তে বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকটি ...াইড শৃঙ্খল আবার অন্তঃস্থভাবে অন্তশৃঙ্খল (...chain) ডাইসালফাইড বন্ডে যুক্ত থাকে।

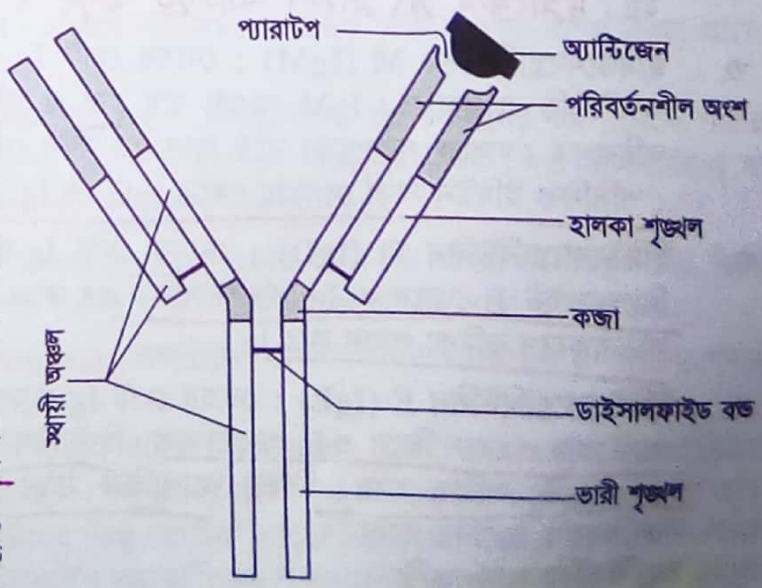

চিত্র ১০.৫ : একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির রেখাচিত্র

৩. স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Constant and ...ariable regions) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডি দুই ...অঞ্চলবিশিষ্ট গঠনে নির্মিত। একটি হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল, ...টি পরিবর্তনশীল অঞ্চল। ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক ...অ্যান্টিবডির ভারী ও হালকা শৃঙ্খলে অ্যামিনো এসিড ...ক্রম (sequence) অনুযায়ী ওই দুটি অঞ্চলে ভাগ করা ...য়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ধরনের ইম্যুনোগ্লোবিনে (যেমন-IgG-তে কিংবা IgA-তে) স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিড ক্রম একই ...কে। কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশকে অ্যান্টিজেন (জীবাণু) ধরার জন্য আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে খাপ খাওয়াতে হয় বলে ...নের পরিবর্তন হতে পারে। পরিবর্তনশীল অঞ্চল নির্মাণে ভারী ও হালকা উভয় শৃঙ্খলই অংশ গ্রহণ করে। অ্যান্টিজেন

ধরার এ অংশটির নাম **প্যারাটপ** (paratope)। এটি **তালা-চাবি** (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে 'চাবি' হচ্ছে প্যারাটপ, আর 'তালা' অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

ভারী শৃঙ্খলের স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিডের ক্রম-এর ভিত্তিতে অ্যান্টিবডি মাত্র ৫ ধরনের হলেও পরিবর্তনশীল অঞ্চলের (ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের) প্যারাটপে যখন জরুরী অবস্থায় বিশেষ বিশেষ জিনখন্ডের (subgene) এলোপাথারি (random) সম্মিলনের ফলে পরিবর্তন ঘটে তখন কোটি কোটি ভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। [এ প্রক্রিয়ার নাম **VDJ রিকম্বিনেশন**। V= Variable, D = Diversity, J = Joining subgene] বিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে। আমাদের জীবদ্দশায় ১০ কোটি অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করবে বা করতে পারে তা অকল্পনীয়।

৪. কব্জা অঞ্চল (Hinge region) : অ্যান্টিবডি অণুর বাহুদুটি যে সংযোগস্থল থেকে দুভাগ হয়ে যায় তা কব্জা অঞ্চল। অংশটি অ্যান্টিবডিকে কিছুটা নমনীয়তা দান করে। বাহুদুটির দুপ্রান্তে অবস্থিত একটি করে মোট দুটি প্যারাটপে দুটি অ্যান্টিজেনকে আটক করা যায়।

অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ (Types of Antibody)

অ্যান্টিবডির গড়নে যে ভারী শৃঙ্খল রয়েছে তাতে অ্যামিনো এসিডের ক্রমের (sequence) ভিত্তিতে ভারী শৃঙ্খল ৫ ধরনের: γ-(gamma), α (alpha), μ (mυ), ∈ (epsilan) এবং δ (delta)। এ পাঁচ ধরনের ভারী শৃঙ্খলবিশিষ্ট অ্যান্টিবডিগুলো নিচেবর্ণিত ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত। GAMED — Ig

১. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন G(IgG)** : দেহের মোট ইমিউনোগ্লোবিউলিনের (Ig) ৭৫% IgG। রক্ত, লসিকা, অন্ত্র ও টিস্যু তরলে এ Ig বিস্তৃত থাকে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমিক সক্রিয় করে এবং অনেক বিষাক্ত পদার্থকে প্রশমিত করে। IgG ই- একমাত্র অ্যান্টিবডি যা গর্ভাবস্থায় অমরা অতিক্রম করে মায়ের অর্জিত প্রতিরক্ষাকে ভ্রূণদেহে বাহিত করে। দুধ, লালারসে IgG. সেকেন্ডারি/গৌণ সাড়াতে IgG

২. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন A (IgA)** : দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১৫% হচ্ছে IgA। এ ধরনের অ্যান্টিবডি মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত থাকে, যেমন–পরিপাক, জনন ও শ্বসনতন্ত্রে বিস্তৃত হয় এবং সেখানে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও অণুকণাকে প্রশমিত করে। মায়ের দুধেও IgA পাওয়া যায় এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুদেহে স্থানান্তরিত হয়। দ্রুতের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। অশ্রু, লালা, পরিপাকরসে

৩. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন M (IgM)** : দেহের মোট Ig-এর ৫-১০% IgM। ABO ব্লাড গ্রুপের রক্তকণিকার অ্যান্টিবডি এ ধরনের। IgM পাওয়া যায় রক্ত ও লসিকায়। এটি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং বহিরাগত কোষকে পরস্পরের সঙ্গে আসঞ্জিত করে দেয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ইমিউন সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে IgG ও IgM একত্রে কাজ করে।

৪. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন D (IgD)** : দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১%-এরও কম হচ্ছে IgD। রক্ত, লসিকা ও লিম্ফোসাইট B-কোষে এ Ig পাওয়া যায়। এর কাজ অজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞানিদের ধারণা, IgD B- কোষকে সক্রিয়করণে ভূমিকা পালন করে।

৫. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন E (IgE)** : দেহের মোট Ig-র মধ্যে প্রায় ০.১% হচ্ছে IgE। এটি দুর্লভ Ig। B-কোষ, মাস্টকোষ ও বেসোফিলে এ Ig পাওয়া যায়। হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে এটি প্রদাহ সাড়া (inflammatory response) সক্রিয় করে। বিভিন্ন অ্যালার্জিক সাড়া দানে (যেমন-সন্ধিবাতে) এ অ্যান্টিবডির ভূমিকা বেশ নেতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি

মানবদেহকে সুস্থ-সবল-সচল রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির অ্যান্টিবডি অব্যাহতভাবে যে অনন্য গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে সে সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো অ্যান্টিজেন দেহের ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে অবশেষে ৩য় স্তরে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডির সুসমঞ্জস কাজের ধারায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অ্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে ৩টি প্রধান শিরোনামভুক্ত করা যায় ঃ

১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ, ২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ এবং ৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ

১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ : রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণাকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা অন্যতম প্রধান কার্যপদ্ধতি। নিচেবর্ণিত ৩ ভাবে অ্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে।

i. **স্তূপীকরণ বা অ্যাগ্লুটিনেশন** (Agglutination) : যে প্রক্রিয়ায় রক্ত বা লসিকায় সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণা দলা পাকিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাকে **স্তূপীকরণ** বলে। প্রত্যেক অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। দেহে অণুজীব বা অণুকণার অনুপ্রবেশ ঘটলে সেই বহিরাগত পদার্থের গায়ে উপস্থিত অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে অ্যান্টিবডি ক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুটি করে অ্যান্টিজেন-বাঁধনস্থল থাকে, অতএব একটি অ্যান্টিবডি দুটি অ্যান্টিজেনকে আটকাতে পারে। এভাবে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে নিশ্চল বড় স্তূপের মতো পড়ে থাকে। ফলে খুব সহজেই ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল নামক শ্বেত-রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তা গ্রাস করে। – IgM | IgG বহু কার্যকরী.

ii. **অধঃক্ষেপন** (Precipitation) : যে প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় অ্যান্টিজেনের (যেমন–টিটেনাস টক্সিন) আণবিক যৌগ **প্রিসিপিটিন** (precipition) অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে বড়, জালিকাকার ও অদ্রবণীয় বস্তু হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয় তাকে **অধঃক্ষেপণ** বলে। অধঃক্ষিপ্ত অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি দলাকে খুব সহজে ফ্যাগোসাইটিক কোষ গ্রাস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।

iii. **প্রশমন** (Neutralization) : যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের ক্ষতিকারক অংশগুলোকে ঢেকে রেখে ক্ষতিকর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বাধা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিংবা অ্যান্টিজেন–ক্ষরিত টক্সিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে তার বিষক্রিয়া থেকে অন্যান্য দেহকোষকে রক্ষা করে তাকে **প্রশমন** বলে। IgG

iv. **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি যে প্রক্রিয়ায় সরাসরি বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি আক্রমণ ও বিদীর্ণ করার মধ্য দিয়ে অণুজীবের দেহকে ফাটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তাকে **বিশ্লিষ্টকরণ** বলে। IgM

২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ : অন্তত ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম** বা **কমপ্লিমেন্ট** বলে। অ্যান্টিবডির কাজের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভিন্ন উপায়ে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে।

i. **অপসোনাইজেশন** (Opsonization) : দেহে অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে অ্যান্টিজেন–অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ...লে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রোটিন নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে প্রচন্ডভাবে ফ্যাগোসাইটোসিসে ...র তুলে। এ প্রক্রিয়াকে **অপসোনাইজেশন** বলে। এভাবে কম সময়ে শতগুণ বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাসে ...াইটগুলো ভূমিকা পালন করে।

ii. **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক ধরনের কমপ্লিমেন্টে গঠিত **লাইটিক কমপ্লেক্স** (lytic complex) নামে একটি বিশেষ গ্রুপ। এ গ্রুপভুক্ত কমপ্লিমেন্ট বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের কোষঝিল্লি বিদারণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

iii. **স্তূপীকরণ** (Agglutination) : কমপ্লিমেন্ট থেকে উৎপন্ন পদার্থের বিক্রিয়ায় বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যার ফলে অণুজীবগুলো পরস্পর সংলগ্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল স্তূপের মতো পড়ে থাকে।

iv. **ভাইরাসের প্রশমন** (Neutralization of Viruses) : কমপ্লিমেন্ট থেকে ক্ষরিত এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থ ভাইরাসের গঠনকে আক্রমণ করে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

v. **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis): অণুজীবের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু, রক্তজমাট ও ব্যাকটেরিয়ার নানা রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো সেখানে (ক্ষতস্থানে) ধাবিত হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া দেওয়াকে **কেমোট্যাক্সিস** বলে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন ফ্যাগোসাইটকে কেমোট্যাক্সিসের প্রতি সাড়া দিতে আকৃষ্ট করায়। গন্তব্যে পৌঁছে ফ্যাগোসাইট কমপ্লিমেন্টের সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে পারে।

vi. **মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণ** (Activation of Mast-cells and Basophils) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন মাস্টকোষ ও বেসোফিলকে আশপাশের তরলে হিস্টামিন, হেপারিন ও অন্যান্য পদার্থ ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। ফলে স্থানীয় রক্তপ্রবাহ, টিস্যুতে তরল পদার্থ ও প্লাজমা প্রোটিনের প্রবেশ এবং স্থানীয় টিস্যুর বিক্রিয়া বেড়ে যায়। এসব কারণে সৃষ্ট প্রদাহ সাড়ায় জীবাণু নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

টিকা বা ভ্যাক্সিন হলো রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন।

৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ : কিছু অ্যান্টিবডি, বিশেষ করে IgE প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করে। যে কোনো ক্ষতস্থানে প্রদাহের যে ৪টি মৌলিক ও ধারাবাহিক বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে ; (i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায় ; (ii) জায়গাটি গরম হয়; (iii) ফুলে যায়, এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায়। প্রদাহের কারণে ক্ষতস্থানে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বহিরাগত জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। এভাবে মাস্টকোষ ও বেসোফিলের ক্ষরণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে সংক্রমণের বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়।

অ্যান্টিবডি	প্যাথোজেন / অ্যান্টিজেন
১. অ্যান্টিবডি বহিরাগত ক্ষতিকর বস্তুর (অ্যান্টিজেন) উপস্থিতি ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিরোধী বস্তু।	১. অ্যান্টিজেন বহিরাগত বস্তু যা প্যাথোজেন নামে পরিচিত এবং পোষকের দেহে অনুপ্রবেশ করে।
২. অ্যান্টিবডি রাসায়নিক প্রকৃতিতে কেবলমাত্র প্রোটিন।	২. অ্যান্টিজেন রাসায়নিক প্রকৃতিতে প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড এবং গ্লাইকোপ্রোটিন। পরাগরেণু, ডিমের সাদা অংশ, রক্ত কণিকা ইত্যাদিও অ্যান্টিজেন বলে বিবেচিত হয়।
৩. অ্যান্টিবডি অধিকাংশ সময় প্লাজমায় অবস্থান করে।	৩. অবস্থানগতভাবে অ্যান্টিজেন লোহিত কণিকার উপরিতলে বা অণুজীবের উপরিতলে অবস্থিত।
৪. অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতেই কেবলমাত্র অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। এর স্বকীয় কোন উপস্থিতি নেই।	৪. অ্যান্টিজেনের সক্রিয় অবস্থান রয়েছে। এরা মূলত অণুজীব বা প্রকৃত বস্তু।
৫. জীবদেহ রক্ষায় অ্যান্টিবডি ভূমিকা পালন করে। এরা রক্ষণাত্মক।	৫. জীবদেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে অ্যান্টিজেন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরা ধ্বংসাত্মক।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা (Role of Vaccine in Immune System)

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা জীবাণুর নির্যাস বা জীবাণু সৃষ্ট পদার্থ (টক্সিন) কিংবা সংশ্লেষিত বিকল্প পদার্থ থেকে উৎপন্ন যে বস্তু অ্যান্টিজেনের মতো আচরণ করে দেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্নে উদ্দীপনা জোগায় এবং এক বা একাধিক রোগের বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে তাকে **ভ্যাক্সিন** (vaccine) বলে। শরীরে মারাত্মক রোগের ভ্যাক্সিন দেওয়া থাকলে ভবিষ্যতে ঐসব রোগ দেহকে অসুস্থ করতে পারে না। ভ্যাক্সিন প্রয়োগকে **টিকা দেওয়া** নামে পরিচিত।

ভ্যাক্সিনের প্রভারভেদ

উৎপাদনের ধরনের উপর ভিত্তি করে ভ্যাক্সিন নিচে বর্ণিত ৫ প্রকার :

১. **নিষ্ক্রিয়** (Inactivated) : রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে রাসায়নিক, তাপ, বিকিরণ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয় জীবাণু থেকে উৎপন্ন। যেমন-ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস প্রভৃতি ভ্যাক্সিন।

২. **শক্তিহ্রাস** (Attenuated) : কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেওয়া জীবিত জীবাণু দিয়ে উৎপন্ন। যেমন-মিজলজ (হাম), ম্যাম্পস, পানিবসন্ত (চিকেন পক্স), টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাক্সিন।

৩. **টক্সোয়ড** (Toxoid) : জীবাণুর নিষ্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ থেকে উৎপন্ন। যেমন-টিটেনাস (ধনুষ্টংকার), ডিপথেরিয়া প্রভৃতির ভ্যাক্সিন।

৪. **সাবইউনিট** (Subunit) : জীবাণুগাত্রের সামান্য অংশ (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) থেকে উৎপন্ন। যেমন-হেপাটাইটিস B ভ্যাক্সিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

৫. **কনজুগেট** (Conjugate) : দুটি ভিন্ন উপাদানে গঠিত ভ্যাক্সিন [ব্যাকটেরিয়ার দেহ আবরণের অংশ+ বাহক প্রোটিন]। যেমন-হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B (Hib) ভ্যাক্সিন।

ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination)

ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে অণুজীবের, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়কে **ভ্যাক্সিনেশন** বলে। প্রক্রিয়াটি সাধারণভাবে **টিকা দেওয়া** (inoculation) নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট রোগের ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট জীবাণু থেকেই সংগ্রহ ও উৎপন্ন করা হলেও প্রক্রিয়াগত কারণে এ পদার্থ মানবদেহে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা রোগ সৃষ্টির পরিবর্তে দেহকে রোগমুক্ত রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। রোগের চিকিৎসায় ভ্যাক্সিনের ব্যবহার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনোথেরাপি (vaccinotherapy) বলে।

ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম **গুটিবসন্তের** (small pox) ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী 'ভ্যাক্সিন বিপ্লব' ঘটিয়ে মানুষের রোগমুক্ত দীর্ঘ সুন্দর জীবনের যে প্রত্যাশা জাগিয়েছেন তার ধারাবাহিকতায় আজ **দ্বিতীয় জেনারেশন** (Second Generation) ভ্যাক্সিন হিসেবে হেপাটাইটিস B ভ্যাক্সিন উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু AIDS ভ্যাক্সিন আজও উৎপন্ন হয়নি।

ভ্যাক্সিনেশনের ফলে মানবদেহ এমন সব রোগ থেকে রক্ষা পায় যা থেকে শুধু অসুখ-বিসুখই নয়, দেহ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের ইমিউনতন্ত্রকে বাড়তি শক্তি যোগাতে ভ্যাক্সিন নিম্নোক্তভাবে সক্রিয় থাকে।

১. অধিকাংশ ভ্যাক্সিনে রোগসৃষ্টিকারী মৃত বা দুর্বল জীবাণুর সামান্য অংশ থাকে। দেহে রোগসৃষ্টি করতে পারে এমন সক্রিয় জীবাণু থাকে না। কোন কোন ভ্যাক্সিনে জীবাণু একেবারেই থাকে না।

২. জীবাণুর অংশবিশেষসহ ভ্যাক্সিন যে দেহে প্রবেশ করে অ্যান্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে। এসব অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে।

৩. মানবদেহে দুভাবে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারেঃ (ক) **অসুস্থ হলে** এবং (খ) **ভ্যাক্সিন নিলে**। জীবাণুর আক্রমণে অসুস্থ হয়ে রোগে ভুগে কষ্ট শেষে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের চেয়ে আগেভাগেই সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাক্সিন গ্রহণ করা বেশি নিরাপদ। কারণ জীবাণুর আক্রমণে দেহ অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ নিরোগ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ দেহ বিকলাঙ্গ হতে পারে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুৎসিত দাগ হতে পারে, কিংবা জীবন হানিও ঘটতে পারে। অতএব, ভ্যাক্সিনের মতো অস্ত্র থাকতে আমরা কেন দুর্ভোগ পোহাব ?

৪. ভ্যাক্সিন গ্রহণের ফলে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি দেহে দীর্ঘদিন বা আজীবন উপস্থিত থাকে। অ্যান্টিবডিগুলো জানে কিভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হয়। অতএব, ভ্যাক্সিন নেওয়ার পর ভবিষ্যতে যদি আসল জীবাণু দেহে প্রবেশ করে তাহলে অ্যান্টিবডির কৌশলে দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র জীবাণু ধ্বংসে সক্রিয় হবে।

৫. অনেক ভ্যাক্সিন আছে যা একবার নিলে আজীবন দেহে কর্মক্ষম থাকে। মাঝে-মধ্যে **অতিরিক্ত ডোজ** (booster shot) নিতে হয়।

কিছু ভ্যাক্সিন রয়েছে যা **মিশ্র ভ্যাক্সিন** নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন যুক্ত করে দেহে প্রবেশ করানো হয়, যেমন–MMR (Measles, Mumps and Rubella) ভ্যাক্সিন।

প্রতিটি মানবদেহ (শিশু বা বয়স্ক) নির্দিষ্ট রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণ থাকে। কিন্তু সবার প্রতিরক্ষাতন্ত্র এক ও সবল নয় বলে ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সবল করা হয়। শিশু বয়সে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন নেয়া থাকলে পরিবারও থাকে নিশ্চিন্ত।

ভ্যাক্সিনের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccines)

শৈশব ও কৈশোরকালীন সময়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। পোলিও, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়াসহ অন্যান্য মারাত্মক জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও আজীবন কষ্টকর রোগ-ব্যাধির কবল থেকে নিজের বংশধরকে বাঁচাতে সবাই তৎপর থাকেন। সুস্থ পরিবার ও জাতি গড়তে সুস্থ-সবল বংশধর প্রয়োজন। এ কারণে শৈশবেই ভ্যাক্সিন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সবদেশের সরকার বিবেচনা করে থাকে।

ভ্যাক্সিন সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সামান্য। পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩ মিলিয়ন লোকের জীবন রক্ষা হয় এবং রোগের কষ্ট থেকে ও স্থায়ী বিকলাঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা পায় আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ। ভ্যাক্সিনে প্রতিরোধযোগ্য হাম, হুপিংকাশি, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতি যে সম্ভাব্য জটিলতা (হাসপাতালে ভর্তি, অঙ্গচ্ছেদ, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পঙ্গুত্ব, মেনিনজাইটিস, বধিরতা, এমনকি মৃত্যু) সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্তি পায়। শিশু যদি ভ্যাক্সিন না নিয়ে থাকে তাহলে রোগ ব্যাধি অন্য শিশুতে ছড়াতে পারে। এমন শিশু রোগাক্রান্ত হতে পারে যার দেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ সম্ভব নয় (যেমন-লিউকেমিয়া বা অন্য কোনো ক্যান্সার আক্রান্ত, কিংবা অনাক্রম্যতন্ত্রে সমস্যা আছে এমন)। শিশুকে ভ্যাক্সিন না দিলে রোগ-ব্যাধি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবার সমাজে ফিরে আসবে। ভ্যাক্সিনেশনের ফলে শিশু থাকবে সুস্থ-সবল, হাসি-খুশি। অসুখে ভুগে মনমরা হয়ে ঘড়ে বসে থাকবে না। প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। এ আশা পূরণে ভ্যাক্সিনেশন হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।

অতএব, দুশ্চিন্তাহীন জীবন যাপনের জন্য শুধু নিজের সন্তানকেই নয়, সমাজের প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে ভ্যাক্সিনেশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা
(Role of Memory Cell in Immune System)

কিছু জমা রাখা এবং প্রয়োজনে তা স্মরণ করার ক্ষমতাকে **স্মৃতি** (memory) বলে। স্মৃতি সংরক্ষণ এবং যথাসময়ে পুনর্ব্যবহার দেহরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত নানান প্রাকৃতিক আক্রমণকারীর শিকার হচ্ছে। মানবদেহ চোখের আড়ালে সে সব আক্রমণ থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করছে তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের দেহ প্রতিরক্ষায় কীভাবে, কোন লেভেলে, কোন প্রহরী ক্লান্তিহীন কাজ করে যাচ্ছে তা জানতে পারলে নিরোগ দেহের প্রয়োজনীয়তা ও দেহ নিরোগ রাখার উপায় উদ্ভাবন সহজতর হবে।

প্রতিরক্ষাতন্ত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে অণুজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: (১) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট **প্রতিরক্ষা সাড়া** (immune response) দান করা; এবং (২) অনুপ্রবেশকারীর কথা **মনে রাখা**। দুধরনের কোষ এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কোষগুলো সারা দেহে সংবহিত হয়ে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু খুঁজে বেড়ায় এবং আগের কথা মনে রেখে দ্রুত জীবাণুধ্বংসে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জীবাণু সম্বন্ধে আগে থেকেই ধারণা থাকায় রোগ সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয় কিংবা প্রকাশ ঘটলেও তার মাত্রা থাকে সামান্য, অক্ষতিকর পর্যায়ের। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় **স্মৃতিকোষ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করে। স্মৃতিকোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট নামক অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা। লিম্ফোসাইট দুধরনের : (১) T-**লিম্ফোসাইট** ও (২) B-**লিম্ফোসাইট**।

T-লিম্ফোসাইট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে। অন্যদিকে, B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে। এসব কোষ অস্থিমজ্জায় **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে সৃষ্টি হয় এবং লসিকা বাহিকার মাধ্যমে থাইমাস, লসিকাপর্ব, প্লীহা ও হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি রক্ত সংবহতন্ত্রে পৌঁছে পরিণত হয়।

স্মৃতিকোষের (memory T-cell, memory B-cell) প্রধান ভূমিকা হচ্ছে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশিত জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলা। এভাবে গড়ে উঠে **অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা**। প্রথমবার কোনো জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে দেহ তার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে যেভাবে রোগমুক্ত হয় তাকে **প্রাইমারি সাড়া** (primary response) বলে। আবারও যদি ঐ জীবাণু আক্রমণ করে তখন স্মৃতিকোষগুলো প্রাইমারি সাড়ার স্মৃতিকথা মনে করে দ্রুততর সাড়া দিয়ে দেহকে রোগমুক্ত রাখে। দ্বিতীয়বারের সাড়াকে **সেকেন্ডারি সাড়া** (secondary response) বলে। সেকেন্ডারি সাড়ার কারণে আমরা প্রথম একবার ঘটে যাওয়া সংক্রমণ আর তেমন টের পাই না, কিংবা একেবারেই টের পাই না।

দ্বিতীয়বার কোনো জীবাণুর প্রবেশ ঘটলে স্মৃতি T-কোষ আর স্বাভাবিক না থেকে অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে জীবাণু ধ্বংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, স্মৃতি B-কোষ মানবদেহের রক্তপ্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না কিন্তু সেকেন্ডারি সাড়ায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণকারী বিপুল সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করে দেহকে রোগমুক্ত রেখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

প্যাথোজেন : প্যাথোজেন বলতে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে বুঝায়। ব্যাকটেরিয়া, ফানজাই, ভাইরাস, প্রোটোকটিস্ট ইত্যাদি প্যাথোজেনের উদাহরণ।

B-কোষ এবং T-কোষ : B-কোষ এবং T-কোষ প্রকৃতপক্ষে লিম্ফোসাইট। T-কোষ ভ্রূণের থাইমাস গ্রন্থিতে এবং B- কোষ যকৃত ও প্লীহাতে এসে পরিণতি লাভ করে। T-কোষ কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা এবং B-কোষ রসভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী।

অ্যান্টিজেন : যে সকল বিজাতীয় জীবাণু বা টক্সিক বস্তু দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাকে অ্যান্টিজেন বলে।

অ্যান্টিবডি : অণুজীবসদৃশ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী প্রোটিন অণুর আবির্ভাব ঘটলে অথবা প্রতিবিষ/ টক্সিসিটি (toxicity) বিনষ্টকারীকে অ্যান্টিবডি বলে।

সহজাত প্রতিরক্ষা : সহজাত প্রতিরক্ষা দেহের কোষ নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নির্দিষ্ট।

অর্জিত প্রতিরক্ষা : অর্জিত প্রতিরক্ষা অ্যান্টিজেন সুনির্দিষ্ট যা দেহ প্রতিরক্ষার স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত হয় ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কার্যকর থাকে।

২. ফ্যাগোসাইটকে বাইরাগত ব্যাকটেরিয়া শনাক্তে সহযোগিতা করে কে ?
ক) কমপ্লিমেন্ট খ) অপসোনিন
গ) হিস্টামিন ঘ) ইন্টারফেরণ

৩. রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হলো–
i) চোখের অশ্রু ii) কানের মোম
iii) পাকস্থলির HCl
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

...পদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

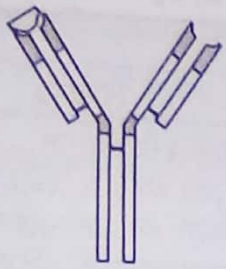

...পকের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪. উদ্দীপকে চিত্রিত বস্তুটি –
i) প্রোটিনের পলিমার
ii) রক্তের প্লাজমা কোষ হতে সৃষ্টি হয়
iii) প্রতিরক্ষার তৃতীয় স্তরে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. উদ্দীপকের চিত্র সম্পর্কে নিচের কোন তথ্যটি সত্য ?

৭. উদ্দীপকের রোগ প্রতিরোধী কোষে বিভিন্ন অ্যান্টিবডির মধ্যে নিচের কোন অ্যান্টিবডিটি বিদ্যমান ?
ক) IgG খ) IgM গ) IgD ঘ) IgE

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮. জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে দেহের প্রতিরক্ষায় রক্তের ভূমিকা বোঝালেন।
নিচের কোনটি উদ্দীপক ?
ক) প্লাজমা খ) R.B.C গ) W.B.C ঘ) অনুচক্রিকা

৮. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিরক্ষার উপায়গুলো হচ্ছে–
i) জীবাণুকে সক্রিয় করে
ii) জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে
iii) এন্টিবডি তৈরি করে
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১০। সেদিন শিক্ষক ক্লাশে রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ত্বক, পাকস্থলি, রক্ত ইত্যাদির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি আরও বললেন প্রতিরক্ষা মূলত দুধরনের– সহজাত ও অর্জিত।
ক) অ্যান্টিবডি কী ?
খ) ফ্যাগোলাইসোজোম কীভাবে গঠিত হয় ?
গ) আমাদের ইমিউনতন্ত্রকে বাড়তি শক্তি জোগাতে ভ্যাক্সিন কীভাবে কাজ করে ?

দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা

স্মৃতিকোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট নামক অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা। লিম্ফোসাইট দুধরনের ঃ (১) T-লিম্ফোসাইট ও (২) B-লিম্ফোসাইট T-লিম্ফোসাইট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে।
এসব কোষ অস্থিমজ্জায় স্টেমকোষ (**stem cell**) থেকে সৃষ্টি হয় এবং লসিকা বাহিকার মাধ্যমে থাইমাস, লসিকাপর্ব, প্লীহা ও হৃৎপিন্ডের কাছাকাছি রক্ত সংবহনতন্ত্রে পৌঁছে পরিণত হয়।

স্টেমকোষ ঃ
স্টেমকোষ দুধরনেরঃ ভ্রুণীয় (embryonic) এবং পরিণত (adult)।
ভ্রূণীয় স্টমকোষের অবস্থান হচ্ছে **ভ্রূণের ব্লাস্টোসিস্ট** দশায় অন্তঃস্থ কোষ পিন্ডে
পরিণত স্টেমকোষ পাওয়া যায় অস্থিমজ্জা, চর্বিকোষ ও রক্তে।
প্রথমবার কোনো জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে দেহ তার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে যেভাবে রোগমুক্ত হয় তাকে **প্রাইমারি সাড়া** বলে।